Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501053 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

# Analysis of the aesthetic vision and psychological importance of music, dance and drama
# সংগীত, নৃত্য ও নাটকের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টি এবং মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ

Dr. Sujata Dey
Assistant Professor
Vocal Music
Rabindra Bharati University Durshikkha Bibhag

Received on: 14th May 2026
Accepted on: 28th May 2026

**Abstract:**
The essay explores the fundamental definition, essence, and evolutionary history of aesthetics, tracing the origins of art back to the Latin term 'Ars.' In the contemporary landscape, art is categorized into two distinct yet overlapping domains: Fine Arts, which focuses on the pursuit of creative pleasure and beauty, and Crafts, which addresses social needs and utilitarian purposes. This dual nature reflects the tension between pure expression and practical application in human civilization. The core essence of art is further illuminated through the diverse philosophical lenses of history's greatest thinkers. To Plato and Aristotle, art was fundamentally an act of 'mimesis' or imitation of the physical world. In contrast, Hegel interpreted art as a profound manifestation of the 'Absolute' or the ultimate spirit. Rabindranath Tagore offered a more humanistic perspective, defining art as the 'joy of the surplus,' suggesting that artistic creation arises when human emotions overflow beyond the boundaries of mere survival and biological necessity.

In the realm of aesthetics, the essay delves into the moral and social frameworks that define artistic value. Immanuel Kant's theory of 'purposiveness without purpose' highlights the disinterested nature of beauty, while Marxist historicism connects art to the ethical and social shifts of its time. Additionally, the text examines the intersection of art and science through music, illustrating how melodic vibrations psychologically and neurologically influence human behavior and brain activity. Ultimately, art is portrayed as an aesthetic externalization of inner truth, transcending utility to foster universal joy and a heightened state of consciousness

**Key Words:**
Aesthetics, Arts, Kant's Philosophy, Aesthetic Intellect, Musical Science

## মূল প্রবন্ধ


© Santiniketan Sahityapath

শিল্পের সংজ্ঞা বলতে গেলে প্রথমেই যা বুঝতে হয় তা হলো শিল্পের স্বরূপ। শিল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো ‘Art’ যার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ ‘Ars’ থেকে। এই ars শব্দটি আধুনিক ইংরেজি শব্দ ‘Craft’ এর প্রতিশব্দ ছিল। বর্তমান শিল্পশাস্ত্রী, কলাবিদ তথা দার্শনিকগণ art এবং craft এই শব্দযুগলকে পৃথক করে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ শিল্পের দুটি ভিন্ন ধারার জন্ম হয়েছে। একটি হলো ‘fine-arts’ বা চারুশিল্প এবং অপরটি হলো ‘arts of craft’ তথা কারুশিল্প। প্রথমটির লক্ষ সৃজনমূলক প্রতিভাজাত সুন্দর সৃষ্টির পথকে তৈরি করা এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ ব্যক্তিগত বা সামাজিক চাহিদা মেটানো। একটিতে রয়েছে ভাবগত দৃষ্টিকোণ এবং অপরটিতে আছে বস্তুগত আঙ্গিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে, শিল্প হচ্ছে তাই যা নিছক প্রয়োজনের বাইরে এসে অতিরিক্ত একটি তাগিদ মানুষকে চালনা করে এবং সৃজনশীল সৃষ্টিতে নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো শিল্পকে অনুকরণের অনুকরণ বলেছেন এবং সেখানে শিল্পীর স্বাধীন কল্পনাশক্তির বিশেষ কোনো প্রকাশ নেই বলেই মনে করেছেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তাঁর ‘On the Art of Poetry’ তে আলোচনা প্রসঙ্গে নাটক সম্পর্কে বলেছেন যে, এই শিল্পরূপ হচ্ছে, ‘imitation of an action’ অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে তারই অনুকরণমাত্র যা জগতে ঘটে এবং সেই সব ঘটনার সমাজিক প্রতিক্রিয়া। দার্শনিক হেগেল বলেছেন, ‘Art is sensuous presentation of the absolute’। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “জড়তা থেকে মুক্তি দেওয়া, আনন্দ ও ভোগের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া এবং মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা রসসৃষ্টি ও রূপসৃষ্টি বিষয়ে এই হলো শিল্পের কাজ।”[১] আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শিল্প হচ্ছে এক অপূর্ব বস্তু যা একমাত্র বিশেষ প্রতিভার দ্বারাই নির্মাণ করা সম্ভব। সাধারণভাবে আমরা তাকেই শিল্প বলি যার বিকাশ অথবা প্রকাশ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত নয়, বরং একটি সুকুমার বোধ যা কল্পনা-প্রতিভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারা তা অনেক সময়েই অনুভূত হয়। ক্রোচের মতে, “Art is the expression of impression, not impression of expression” অর্থাৎ শিল্প হচ্ছে অনুভূতির অভিব্যঞ্জনা, রূপায়িত ভাবের নয়। গ্রিক শব্দ ‘Aisthetes’ থেকে বর্তমান ‘aesthetics’ শব্দটির আগমন হয়েছে। নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্যশাস্ত্রের আদিনাম বীক্ষাশাস্ত্র। ভারতবর্ষ এবং সুদূর গ্রীসের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান অনেক হলেও প্রাচীন শাস্ত্রী এবং পণ্ডিতগণ দেখেছেন যে প্রাচ্যের বীক্ষাশাস্ত্র এবং পাশ্চাত্যের aesthetics এর মধ্যে এক বিশেষ যোগসূত্র আছে। বীক্ষা শাস্ত্রটির মূলে রয়েছে বস্তুজগতকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করার প্রবণতা। বীক্ষণ শব্দটির অর্থ বিশেষরূপে দেখা। জগতে যা কিছু সাধারণ, যা কিছু তুচ্ছ তাই-ই হয়তো মনীষীগণের কাছে বিশেষভাবে দেখার বিষয়বস্তু, তারই মধ্যে তাঁরা খুঁজে নেন নতুনত্বের স্বাদ। এই দৃষ্টি প্রকৃতি সকলকে দেন না। একমাত্র শিল্পী মনই তাঁর শিল্পসত্বাকে আধার করে এইরূপ দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হন। জাগতিক এমন অনেক ঘটনা নিত্যদিন ঘটে চলে যা সাধারণ মানুষ সহজেই এড়িয়ে যায়। কিন্তু শিল্পী, কল্পনাপ্রতিভা দিয়ে সে সব ঘটনা থেকেও গড়ে নিতে পারেন তাঁর শৈল্পিক চরাচর। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে প্রকৃত অর্থে শিল্পের নৈতিক বা গঠনগত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে শিল্পী মন তাঁর আবেগ, ভাব, বোধ প্রভৃতি দিয়ে যে সৃজন সৃস্টি করেন যা অন্য কারো মনে রসের সঞ্চার ঘটাতে সক্ষম, তাই-ই শিল্প নামে আখ্যায়িত হয়।

নন্দনতত্ত্ব হলো দর্শন শাস্ত্রের এমন একটি শাখা যেখানে সৌন্দর্য, শিল্প, স্বাদ এবং সৌন্দর্য সৃষ্টি ও তার উপভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। আরো বৈজ্ঞানিকভাবে বললে হয় নন্দনতত্ত্ব মানুষের সংবেদনশীলতা ও আবেগের মূল্য এবং অনুভূতি ও স্বাদের বিচার নিয়ে আলোচনা করে। আর একটু স্থূল বা বৃহৎ অর্থে বিশেষজ্ঞরা বলেন, নন্দনতত্ত্ব শিল্প, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি নিয়ে সূক্ষ্ম ও সমালোচনাত্মক আলোচনা করে। ‘সৌন্দর্যতত্ত্ব’ কথাটি ব্যাপক। এ কারণে এর বিষয়বস্তুর সীমা নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। সৌন্দর্যতত্ত্বের মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি, শিল্পকলার বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্য প্রভৃতি সমস্যাকেই সাধারণত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে নীতিশাস্ত্রেরও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ-ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবর্তনে সৌন্দর্যতত্ত্বের ভূমিকা আলোচিত হয়।

সাধারণভাবে সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আদিম অনুভূতি বলে মনে করা হয়। প্রকৃতির মোকাবিলায় আদিকাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উৎস হিসাবে কাজ করেছে। এরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোনো কোনোটি মানুষের মনের আবেগময় প্রতিক্রিয়া। এই আবেগময় প্রতিক্রিয়ার মূলে মানুষের জীবন রক্ষার অচেতন জৈবিক প্রয়োজনই আদিমকালে সমধিক কাজ করেছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনা এবং শক্তির প্রকাশকে আপন জীবন রক্ষার সহায়ক কিংবা ক্ষতিকারক বলে চিহ্নিত করেছে। এ সমস্ত শক্তিকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের মনে জাগরুক রাখার সে চেষ্টা করেছে। এই আদিম বোধ থেকেই আদি শিল্পকার্যের সৃষ্টি। এই উৎস থেকে সামাজিক ভালোমন্দ বোধেরও উৎপত্তি।


© Santiniketan Sahityapath

মানুষের নিজের জীবনের মতোই সৌন্দর্যানুভূতির ইতিহাস দীর্ঘ। সভ্যতার জটিল বিকাশের ধারায় সৌন্দর্যতত্ত্বকেও প্রাথমিক যুগে সহজ এবং আধুনিককালে জটিল এবং অবাস্তবের লক্ষণযুক্ত দেখা যায়। কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির মনের আবেগময় অনুভূতি এবং তার ভাষাগত প্রকাশ ব্যতীত শিল্পকলা, ভাস্কর্য, সংগীত এবং অন্যান্য মানবিক সৃষ্টিকে সুন্দর কিংবা অসুন্দর এবং ভালো কিংবা মন্দ হিসাবে বিচারের প্রয়াসকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব বলতে উপর্যুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ কোনো তত্ত্বকে বুঝায় না। এর দ্বারা উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উপরে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চিন্তাবিদের চিন্তা কিংবা ভাবধারার কথা বুঝায়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সামগ্রকি আলোচনায় সুন্দর এবং অসুন্দরের অথবা ভাল এবং মন্দের কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ কিংবা মানদণ্ড আছে কিনা সে প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করা হয়।

সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ব্যাবিলন, মিসর, ভারতবর্ষ এবং চিনের দাস — প্রধান সমাজে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে গ্রিসের হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিসস্টটল এবং অপরাপর দার্শনিকের রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের জটিলতর বিকাশের আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন রোমের দার্শনিক লুক্রেশিয়াস এবং হোরেসও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যযুগে সেন্ট অগাস্টিন এবং টমাস একুইনাস প্রমুখ ধর্মতাত্ত্বিকগণ সৌন্দর্যতত্ত্বে রহস্যবাদের আমদানি করেন। তাঁদের মতে, জগতাতীত এক ঐশ্বরিক সুন্দরের অস্তিত্ব রয়েছে। সেই ঐশ্বরিক সুন্দরের মানদণ্ডেই জাগতিক বস্তু নির্বিশেষে সৌন্দর্য পরিমাপ করতে হবে। মধ্যযুগের এই রহস্যবাদের প্রতিক্রিয়া ঘটে পরবর্তীকালে নব-জাগরণের চিন্তাবিদ এবং দার্শনিকগণের মধ্যে। এঁদের মধ্যে পেতরার্ক, আলবার্ট, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, দুরার, ব্রুনো এবং মন্টেনের নাম বিখ্যাত। পাশ্চাত্যের নব-জাগরণের পরবর্তী জ্ঞানান্বেষণের যুগের চিন্তাবিদদের মধ্যে বার্ক, হোগার্ত, ডিডেরক, রুশো, লেসিং প্রমুখ খ্যাতি অর্জন করেন। মানবতাবাদের এই ঐতিহ্যকে বহন করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিলার এবং গ্যেটে ঘোষণা করেন যে, সৌন্দর্য এবং শিল্পের উৎস হলো মানুষ এবং তার বাস্তব জীবন।

সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ সব যুগেই পাওয়া যায়। এদের একটি হচ্ছে সৌন্দর্য সম্পর্কে বস্তুবাদী ধারণা; অপরটি ভাববাদী। ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব সৌন্দর্যকে অতি-প্রাকৃতিক একটি সত্তা বলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।[২] অতি-প্রাকৃতিক এই সত্তা সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এবং সিদ্ধির অতীত। সমাজের উচ্চতর শ্রেণির মানুষের পক্ষেই এই নিকষ সুন্দরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। এরূপ ব্যাখ্যায় ভাববাদী সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং সুন্দরের ধর্মীয় রহস্যবাদী কল্পনায় কোনো পার্থক্য নেই। সাধারণ মানুষকে অজ্ঞানতার মোহে আবদ্ধ রাখার প্রয়াস সমাজের শক্তিমান শ্রেণিগুলি সব যুগেই করে এসেছে। সৌন্দর্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে দর্শনের অন্যান্য মৌলিক প্রশ্নের ন্যায় ভাববাদের বিরোধী ব্যাখ্যা হচ্ছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ মানুষের বাস্তব পরিবেশ এবং জীবনের মধ্যেই সৌন্দর্য্যানুভূতির সৃষ্টি এবং বিকাশকে লক্ষ করেছেন। সৌন্দর্যতত্ত্বে বস্তুবাদ এবং ভাববাদের বিরোধ সমাজের শোষক এবং শোষিতের বাস্তব বিরোধের ভাবগত প্রতিফলন।

বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৌন্দর্যতত্ত্বে তিনটি মূল প্রশ্ন — ১) বস্তুজগতে সৌন্দর্যের সৃষ্টি এবং বিকাশ; ২) মনোজগতে সৌন্দর্যানুভূতির ব্যাখ্যা, এবং ৩) শিল্পকর্মের মূল্যায়ন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে পরিবেশের সঙ্গে মানুষের প্রবহমান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ধারাতে ক্রমাধিক পরিমাণে আনন্দজনক জীবনযাপনের তাগিদে সুন্দর, অসুন্দর, মহৎ, হীন, হর্ষ এবং বিষাদ প্রভৃতি অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাপকতার দিক থেকে সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবল শিল্পকলার সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করে না। শিল্পকলার সৌন্দর্যের বিশ্লেষণে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি প্রয়োগগত দিক মাত্র। আরো বৃহৎ অর্থে বলতে গেলে সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। তার সৃজনশীল ক্ষমতার বাস্তব প্রকাশে, মহতের জন্য জীবন উৎসর্গে, দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে যে আনন্দানুভূতি সে বোধ করে কিংবা বর্বরতার আঘাতে যে ঘৃণা তার মনে উদ্ভূত হয়, তার বিকাশ-প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য — এই-ই হলো নন্দনতত্ত্বের আধার।

শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হলো আনন্দ।[৩] শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পী আনন্দ পান। শিল্পরসিক তৃপ্ত হন। সরলভাবে বলা যায়, আনন্দজাত তৃপ্তিই হচ্ছে নান্দনিকতা। আর নান্দনিক বোধের শৈল্পিক প্রকাশ আধুনিক সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ইত্যাদির মূল উপজীব্য অবশ্য নিছক আনন্দসুখ লাভই নয়, বরং বেদনার্ত মর্মস্পর্শী অনুভবের ব্যঞ্জনাও নান্দনিক বোধের অনুষঙ্গ। প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগে এটি ছিল না কিংবা উত্তরাধুনিক কালে এটি থাকবে না, এমনটি বলা যাবে না। নান্দনিক চেতনা মানুষের স্বভাবজাত। আদিম প্রবৃত্তি। এর শিল্পধর্মী প্রকাশও মানববৃত্তির অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী আত্মচেতনার প্রকাশ-প্রবণতা। অর্থাৎ আত্মগত উপলব্ধির মাধ্যমে অস্তিত্ব-চেতনারই প্রকাশ-ভঙ্গিমার কৌশল। নান্দনিক বোধির স্বরূপ এবং এর শিল্পমূল্য — এর ধারণা কী স্বতঃসিদ্ধ কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ


© Santiniketan Sahityapath

আছে। যদি তা স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে এর প্রায়োগ প্রশ্নাতীত, দ্ব্যর্থহীন, কালোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন। কলাকৈবল্যবাদীদের ধারণা এমনটিই। এজন্য তাঁরা "Art for artsake" অর্থাৎ "শিল্পের জন্য শিল্প" শ্লোগানে উচ্চকিত হন। তাঁদের মতে, শিল্পের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। শিল্প স্বয়ম্ভু। কলাকৈবল্যবাদীদের বা রূপকৈবল্যবাদীদের এ বক্তব্যকে যথার্থ বলা যাবে যদি সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মটিকে চরমতত্ব বা পরমসত্তার প্রকাশরূপে প্রমাণিত করা যায়। তা বস্তুগতই বা ভাবগত, অথবা স্বগতভাবেই পরমসত্তার প্রকাশ, কিন্তু বাস্তবে তা প্রমাণ করা কঠিন। তাছাড়া, ইতিহাসে এটি স্পষ্ট যে, বিবর্তন আর বিকাশের প্রবহমানতায় মানবিক চেতনা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করে থাকে। ফলে বিষয় বা বস্তুগত ধারণা বা প্রতীতিও পরিপুষ্টি লাভ করে দেশীয় সীমাবদ্ধতা আর কালিক অভিজ্ঞতায়। এজন্য স্বরূপের দিক থেকে একই হলেও নান্দনিক চেতনার প্রতীতি মাত্রা ও বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন রকম হয়। এই ভিন্নতা থেকেই গড়ে ওঠে নন্দনতত্ত্ব-এর বিবিধ প্রত্যয়। প্রত্যয়ের প্রভাব আংশিক বা সার্বিকভাবে বদলে দেয় প্রতীতির স্বভাবকে। অবশ্য এটি সত্য যে, ব্যক্তিসত্তার মানবিক চেতনা মূলত সমান্তরালপ্রায়। কিন্তু প্রকৃতি-প্রবণতা, পরিমাণ বা মাত্রাগত ব্যাপক ভিন্নতার কারণে নান্দনিক চেতনার বোধ সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। এজন্য এর স্বতঃসিদ্ধ কোনো আকার বা রূপ থাকতে পারে না। একই ফুল বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন মাত্রার সৌন্দর্যস্বাদ দিয়ে থাকে। একই সংগীতে সবাই সমানভাবে মুগ্ধ হয় না, কারো কাছে বিরক্তিকরও বটে। শুধু তাই নয়, এ চেতনা অশুভ-প্রবণতা, বদ-অভ্যাস এমনকি স্বার্থপরতায়ও প্রভাবিত, সংহত বা ক্রীড়নক হতে পারে। এসব কারণে নিছক নান্দনিকতা শিল্পের মানদণ্ড হতে পারে কি-না তা অবশ্যই প্রশ্ন সাপেক্ষ।

প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট-এর মতে, এটি মন্ময় বা আত্মগত। আমাদের নিজেদের মধ্যে যে আগ্রহ বা তৃপ্তির সৃষ্টি হয়, তাই তার উপজীব্য, কিন্তু এটি আত্মগত হলেও সার্বিক। কারণ, তা শুধু ব্যক্তি বিশেষকে তৃপ্ত করে না,এর একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। সুন্দর বস্তু দেখামাত্র আমাদের মনে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তা উদ্দেশ্যবোধক অনুভুতি। সুন্দর বস্তু দর্শনের পর আমাদের মনে শান্তি আসে এবং আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করি। এ অর্থে এটি ইচ্ছের পরিতৃপ্তি। তবে তাতে ইচ্ছাশক্তির কোনো অবদান, বাসনা ও উদ্দেশ্যের ভূমিকা আবিষ্কার করা যায় না, যদিও ইচ্ছার যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়। এ তৃপ্তি নিস্পৃহ তৃপ্তি। পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যের এই হেঁয়ালীপূর্ণ অনুভূতি নিয়েই সৌন্দর্যের সার্বিক উপকরণ গঠিত। সৌন্দর্যানুভূতি প্রত্যক্ষপূর্ব। এর সঙ্গো অনিবার্যতার যে বোধ জড়িত, তা এর সার্বিক ও প্রত্যক্ষপূর্ব বিশিষ্টতার অন্যতম লক্ষণ। যা সুন্দর, তা তৃপ্তির সঙ্গো অনিবার্যভাবে জড়িত। কিন্তু এ অনিবার্যতা অভিজ্ঞতার ঐন্দ্রিয়িক আধেয় বা অভিজ্ঞতার বোধগম্য রূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটি এমন একটি অনিবার্যতা, যাতে অভিন্ন সংবেদনশীলতা হিসেবে সকল যুগের সকল মানুষের নান্দনিক সুখের আবেদন থাকে। যদি কেউ তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার অর্থ হবে সংশ্লিষ্ট অনুভবকারীর সংবেদনশীলতার অভাব আছে। কান্টের সৌন্দর্য শর্তাধীন ও স্বাধীন। তাঁর মতে, পূর্বশর্ত পূরণকারী সৌন্দর্য হচ্ছে শর্তাধীন সৌন্দর্য। এটি স্বাধীন নয়। এ সম্পর্কে আমাদের প্রশংসাও বিশুদ্ধ অর্থে নান্দনিক নয়। কোনো শিল্পকর্মের বিচার যখনই নৈতিক কুসংস্কার, ব্যবহারিক প্রয়োজন কিংবা বৌদ্ধিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনি তা নান্দনিক বিশুদ্ধতা হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে, স্বাধীন সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য ও স্বার্থের চেতনা থেকে মুক্ত। যেমন, ফুলের সৌন্দর্য। কান্ট বলেন, যথার্থ কলার সঙ্গো বিশেষ উদ্দেশ্যের যোগ নেই। কলার এদিকটা সংরক্ষণেই শিল্পীর প্রতিভা নিহিত। শৈল্পিক প্রতিভা মৌলিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং ব্যক্তিগত ধারণাবলীর উৎপত্তি সম্পর্কিত চেতনা ছাড়াই সৃষ্টিশীল। শিল্পকর্ম প্রকৃতির সঙ্গো যথেষ্ট সংগতিশীল। এজন্য তা অর্থহীন হয় না। তবে তা প্রকৃতিকে শুধু অনুকরণই করে না, গ্রহণযোগ্য রূপের মানদণ্ড এবং নান্দনিক অবধারণের নিয়ম প্রণয়ন করে। শিল্পবোধ সম্পন্ন মানুষ যা মূল্যায়নে সক্ষম। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্যের পার্থক্য প্রসঙ্গো কান্ট বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিচারে বিচার্য বস্তুটির পূর্ণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না কিন্তু শিল্পী কি চিত্রিত করতে চান, তা আগে থেকে জানা প্রয়োজন। প্রকৃতিতে একই বস্তু একই সঙ্গো সুন্দর ও কুৎসিত নয়। কিন্তু শিল্পীর সুবিধা এই যে, তিনি কুৎসিতকেও সুন্দর করে চিত্রিত করতে পারেন। কান্টের এ অভিমত থেকে এটি স্পষ্ট যে, একটি অ-নান্দনিক বা অশৈল্পিক বস্তু বা বিষয় শিল্পীর প্রতিভার গুণে নান্দনিক বা শৈল্পিক হতে পারে। বিপরীতক্রমে বলা যায়, শৈল্পিক বিষয়ও শিল্পীর ত্রুটির কারণে অশৈল্পিক হতে পারে। প্রকৃত শিল্পের সৌন্দর্য সংরক্ষণে কান্ট এজন্যই বলেন, শিল্পীকে অন্যান্যের নান্দনিক অনুভূতির সঙ্গো একাত্ম হতে হবে এবং এরই আলোকে যাচাই করতে হবে নিজের সৃজন প্রতিভাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কান্ট শর্তাধীন সৌন্দর্যের নান্দনিক বিশুদ্ধিতাকে অস্বীকার করলেও শিল্পীর নান্দনিকতাকে তিনি এভাবেই শর্তাধীন করে দেন। অবশ্য অন্যান্যের নান্দনিক অনুভূতির মানদণ্ড কী এবং এর সঙ্গো একাত্মতার পদ্ধতি কী, কতটুকু একাত্মতা সম্ভব এবং আদৌ সম্ভব কি-না এসব প্রশ্ন সাপেক্ষ থেকে যায়। এটি সত্য যে, যা কিছু শর্তাধীন, তা-ই সীমিত। কান্টের নন্দনতত্ত্বে শিল্পীর স্বাধীনতা এভাবেই কিছুটা সীমিত হয়ে


© Santiniketan Sahityapath

পড়ে। তাঁর মতে, "শিল্প বিচারে নৈতিক সংস্কার, ব্যবহারিক প্রয়োজন বা বৌদ্ধিক বিবেচনায় নান্দনিক বিশুদ্ধতা হারিয়ে যায়।" তত্ত্বটির সঙ্গো সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। কিন্তু এই সংঘর্ষ বা বিরোধকে চূড়ান্ত বিবেচনার সুযোগ তিনি দেননি। নান্দনিক বিশুদ্ধতা বা শিল্প বিচারে এ উপযোগগুলির অনুপযোগিতা প্রাসঙ্গিক তাঁর অভিমতটিও চরম কোনো সিদ্ধান্তের আকারে গৃহীত হয় না। কারণ, নান্দনিকতাকে তিনি, "উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যবাদীতা" বা "অপ্রয়োজনের প্রয়োজন" (purposiveness without purpose) বলেছেন।[৪] বিশেষ হয়েও সার্বিক। কান্টের সামগ্রিক দর্শনের যে সমন্বয়ধর্মী ব্যঞ্জনা, তাতে তাঁর "উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যবাদীতা"কে এরই ভাবাদর্শী বলে অনুমিত হয়। বিশুদ্ধ সত্তার ধারণা হিসেবে ঈশ্বর, আত্মা ও পরকাল ইত্যাদিকে প্রতিপাদন-অযোগ্য বললেও শুভবুদ্ধির আদর্শ বা ব্যবহারিক সত্তা হিসেবে এগুলির অস্তিত্বের অনিবার্যতা তিনি স্বীকার করেন। উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যবাদীতা এরকমই ব্যঞ্জনাবাহী। অর্থাৎ আপাত উদ্দেশ্যবিহীন হলেও অন্তর্লীনভাবে শিল্পকর্ম উদ্দেশ্যবোধক। বাহ্য প্রয়োজনের পরিপোষক না হলেও স্বরূপত তা কোনো প্রয়োজনকেই পূরণ করে। তিনি বলেন, প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা যেমন জগতের কারণ হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে, প্রকৃতির বিভিন্ন সুন্দর ও মনোরম বস্তুও তেমনি এদের সৌন্দর্যের কারণ হিসেবে সুন্দরের ধারণা বা উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বহন করে। নান্দনিকতা ও শিল্পের দর্শন নান্দনিকতার স্বরূপ প্রসঙ্গো প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক হেগেল বলেন, যেখানেই ধারণাকে ঐন্দ্রিয়িকভাবে প্রদর্শন করা হয়, সেখানেই সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিতে এমন অনেক জিনিস আছে যা স্ববিরোধী এবং মানুষের নান্দনিক রুচি-বিরুদ্ধ। মন শিল্পকলার মাধ্যমে একে নান্দনিক দাবির প্রতি সাম্যঞ্জস ও সুন্দররূপে পুনর্গঠন করে আদর্শ সত্তায় রূপায়িত করে। অর্থাৎ হেগেলের শিল্প হলো পরমসত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের সমারোহে যেখানে নির্বিশেষ চিদাত্মার অভিষেক ঘটে। তাঁর মতে, সৌন্দর্যই সত্য। হেগেলীয় পরমসত্তা শিল্প, ধর্ম ও দর্শন এ তিনটি পর্বে সমন্বিত। তিনটি পর্বেই ভাব (Content) এর স্বধর্ম বজায় থাকে। পার্থক্য শুধু প্রকাশভঙ্গির। রূপভেদ ঘটে আত্মার প্রকাশে। তবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলো পরমসত্তার খণ্ড প্রকাশ। প্রকৃতির জড়তায় সৌন্দর্যের প্রকাশ ব্যাহত হয়। সর্বত্র সমান হয় না। কোথাও প্রকট, আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন। এজন্য তিনি সৌন্দর্যের স্তরভেদ (Degrees) স্বীকার করেন। তাঁর মতে, ধারণার (Idea) প্রকাশ যেখানে যত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সৌন্দর্যের প্রকাশও ঘটে তত মহত্তর মর্যাদায়। শিল্পভাব ও বস্তুরূপের দ্বন্দ্ব থেকেই সিম্বলিক, ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক আর্টের সৃষ্টি। সিম্বলিক আর্টে বস্তুরূপের জড় উপাদানের প্রাচুর্য ও প্রভাব থাকায় ভাব এখানে ব্যাহত হয়। নিছক আভাসিক মাত্র। যেমন স্থাপত্য শিল্প। ক্লাসিক্যাল আর্টে ভাব ও রূপের একটা সুষম সমণ্বয় থাকে। যেমন, ভাস্কর্য। রোমান্টিক আর্টে ভাব মুখ্য, রূপ বা জড় এখানে গৌণ। শিল্পরূপ এখানে শুধুই সংকেতধর্মী। ভাব বস্তুকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে যায়। কাব্য, সংগীত ও অঙ্কন ইত্যাদি রোমান্টিক আর্টের উদাহরণ। অবশ্য এগুলিতেও হেগেল মাত্রাভেদ করেন জড়ীয় অনুপাতে যেমন অঙ্কন Too objective মানে অধিক বস্তু-নির্ভর, সংগীত Subjective অর্থাৎ বিষয়ী। তবে সুর ও শব্দ ভাবকে দ্যোতিত করলেও তিনি মনে করেন, এটি পুরোপুরি "ভাব" হয়ে ওঠতে পারেনি। রূপের উপাদান কিছুটা হলেও ভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করে। অভাব থেকে যায়। কাব্য এ থেকে মুক্ত। ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এর আবেদন সার্বিক। কাব্যের Formকে হেগেল 'The Sign of an idea, the expression of reason' বলে উল্লেখ করেন। হেগেলীয় শিল্পদর্শনে কাব্যের অবস্থান সর্বোচ্চ। মাত্রাভেদ ও প্রকরণ যা-ই থাকুক, হেগেলের শিল্পদর্শন স্পষ্টতই একটি উদ্দেশ্যবাদী কেন্দ্রিকতায় নিবেদিত আর এ উদ্দেশ্যবাদীতা হচ্ছে পরমসত্তার প্রকাশমান দিক যার সৌন্দর্য অনুভবে শিল্পস্রষ্টা ও শিল্পরসিক আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে পরমভাবে একীভূত হয়। এই ঐক্যই হচ্ছে হেগেলীয় নান্দনিকতার লক্ষ্য।

ভাববাদী ফিখটের মতে, শিল্পীর স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মে তার মাঝে বিদ্যমান পরমাত্মার সৃষ্টিশীল ক্রিয়াপরতার অভিব্যক্তি ঘটে। কোনো সুন্দর বস্তুর ধ্যান উপভোগে মন যে শুধু পরম স্বাধীনতার পূর্বস্বাদ পেয়ে থাকে তা-ই নয়, বরং যে জগত স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল বলে মনে হয়, তা আসলে আমাদের মাধ্যমে কীভাবে উৎপন্ন ও সজ্জিত, তা-ও প্রত্যক্ষ করে। এ থেকে অনুমিত হয়, সৌন্দর্য একটি নৈতিক মূল্য এবং শিল্পীর ক্রিয়াপরতা একটি নৈতিক ক্রিয়াপরতা। যদি তা-ই হয়, তবে বলা যায়, ফিখটের নান্দনিক বোধ অনৈতিক নয় বরং নীতিসম্মত। তাঁর মতে, সৌন্দর্যবোধ বা নান্দনিকতা একটি আদর্শমুখী প্রচেষ্টা মাত্র। কান্টের মতো তিনি উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্যবাদীতায় বিশ্বাসী। শৈল্পিক স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক শেলি জগতকে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, পরমসত্তা জগত সৃষ্টির মাধ্যমে শৈল্পিক উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন করে থাকেন। হেগেলোত্তর নব্যভাববাদী ইতালীর বেনেডিটো ক্রোচের মতে, অনুভূতি বা স্বজ্ঞা মনেরই সৃষ্টি। এর ওপরই কলা বা শিল্প প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ অনুভূতি বা নান্দনিক ক্রিয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। সৌন্দর্য প্রকাশধর্মী

এবং প্রত্যেক সত্য-অনুভূতিই প্রকাশমূলক। শিল্প বা কলা এরই ফলজ। বোধের বাহনেই শিল্পের সৃষ্টি। শিল্পী নিজ অনুভূতিকে কাব্য, সংগীত বা চিত্রকলায় চিত্রিত করেন। তবে বস্তুরূপে প্রমূর্ত এসব শিল্পকর্মই প্রকৃত শিল্পকর্ম নয়। কারণ, প্রকৃত শিল্প মানসিক। প্রকাশের আগেই তা উপলব্ধিতে ছিল। প্রকাশ হচ্ছে বিশেষ রূপ বা প্রতিচ্ছবি। যেমন, মোনালিসার চিত্র। একে প্রকৃত শিল্প বলা অসঙ্গাত, তবে আলঙ্কারিকভাবে এ-কে শিল্প বলা যেতে পারে। অর্থাৎ ক্রোচের সৌন্দর্য বুদ্ধিমুক্ত। স্বজ্ঞা ও স্বজ্ঞাপ্রসূত মানসিক ক্রিয়ার বিষয়াদিকে তিনি নান্দনিকতা বলেন। তাঁর নন্দনতত্ত্বে সংবেদন বলে কিছু নেই। যা কিছু অব্যবহিত ও মূর্ত, তা-ই স্বজ্ঞাপ্রসূত। তবে প্রচলিত অভিজ্ঞতারও একটি নান্দনিক গুণ আছে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, যা অনৈতিক বা অসত্য বা অনুপযোগী, তা-ও সুন্দর হতে পারে। অবশ্য শেষ বয়সে তিনি এ বক্তব্য থেকে সরে এসে শিল্পের নৈতিক রূপ প্রত্যক্ষের স্বীকৃতি দেন। তাঁর "My Philosophy"তে তিনি বলেন, শিল্প প্রচেষ্টাকে নৈতিক বলা যেতে পারে। কারণ, এটি বৃহত্তর জীবনায়নের অঙ্গামাত্র। বৃহত্তর জীবন সাধনাকে নৈতিক বলা গেলে শিল্প এষণাকে নৈতিকধর্মে ঐশ্বর্যবান ভাবা ভুল হবে না।

প্রখ্যাত শিল্প-দার্শনিক রঁমা রঁলা বলেছিলেন, "if art has to dabble falsity, I say good bye to all arts" অর্থাৎ শিল্পে যদি মিথ্যার বেসাতি হয়, তবে আমি শিল্পকে গুড বাই জানাব। তিনি শিল্পে প্রাকৃত সত্যের প্রতিষ্ঠাকে শিল্পের লক্ষ ভেবেছিলেন। এটি হলো বস্তুগত সত্য। প্রথম দিকে তাঁর কাছে বস্তুগত সত্য ও সামাজিক কল্যাণই ছিল নন্দনতত্ত্বের প্রধান বিষয়। তিনি মনে করতেন, যে শিল্প সমাজের কল্যাণ সাধন করে না, তা "শিল্প" পদবাচ্য নয়। মানুষের কল্যাণ সাধনই হবে শিল্পের লক্ষ। আর এ কল্যাণ হচ্ছে বস্তুগত কল্যাণ। এক্ষেত্রে বস্তুগত সত্যের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁর নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি। তিনি বলতেন, "people of the art should represent the fundamental problems of life in simple and intelligent manner." পরবর্তীকালে পরিণত রঁলার সত্য-ধারণার রূপবদল ঘটে। তিনি প্রাকৃত সত্যের সঙ্গো হৃদয়গত সত্যের সম্মিলন ঘটান শিল্পের বিস্তৃত অঙ্গানে। তিনি বললেন, উপাদানের সমন্বয়ই হলো শিল্পসত্তা। তাঁর মতে, নিছক বিদ্যাবুদ্ধির উল্লম্ফনে শিল্প সৃষ্টি হয় না। তিনি বলেন, "if artists thus indulge in intellectual acrobatics in the name of art, I am sure art will die a natural death." রসগ্রাহীদের রুচির বিভিন্নতাকে স্বীকারের মাধ্যমে তিনি শিল্পে কল্পনার সক্রিয়তার স্বীকৃতি দেন। সাধারণের রুচি সৃষ্টিতে ভূমিকা নিতে শিল্পীদের আহ্বান জানান। শিল্পীদের Napoleons of public taste হতে বলেন। রঁলার মতে, শিল্পের একটি কালজয়ী সার্বিকতা আছে। শিল্প বিচিত্রগামী ও ব্যক্তিনির্ভর হলেও সর্বত্রগামী। এজন্য তিনি শিল্প ও সমাজের ঐকান্তিক সম্পর্ক স্বীকার করেন। সামাজিক ঐক্যই শুভ-র চরম প্রকাশ। আর শুভই হচ্ছে সুন্দর। শিল্প হচ্ছে শুভ-সহায়ক। সমগ্রতা যখন শিল্পের প্রকাশের উপজীব্য হয়, তখন তাকে নৈতিক ও কল্পনা প্রসূত বলা যেতে পারে। তাঁর মতে, শিল্পী ও শিল্পরসিকের মাঝে ভাবগত ঐক্য আছে। এটি না থাকলে সার্থক শিল্প হয় না। কিন্তু এ ভাবগত ঐক্যকে রঁলা যখন সামাজিক ঐক্যের শর্তাধীন করে দেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীর স্বাধীনতা ও সৃষ্টির পরিবেশ ব্যাহত হতে পারে। এজন্য, মানব কল্যাণের ধারণাকে যখন প্রকটভাবে শিল্পের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করা হয়, তখন তিনি এর প্রতিবাদ করেন "জন ক্রিস্টোফার" উপন্যাসে। তবে তিনি বলেন, "Be true even through art and artist have to suffer for it. If art and truth cannot live together, then art disappear." অর্থাৎ যদি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পীকে ক্ষতি স্বীকার করতেও হয়, তবুও সত্যকে বাঁচিয়ে রাখো। যদি শিল্প ও সত্যের সহবাস অসম্ভব হয়, তবে শিল্পকে বিসর্জন দাও। যারা "শিল্পের জন্য শিল্প" বলেন, রঁলা তাদের বিরোধিতা করেন। তিনি চান, মানুষের বলিষ্ঠ মনের বলিষ্ঠতর ভাবের প্রকল্প শিল্পে প্রমূর্ত হোক। স্পষ্টতই, শিল্প সৃষ্টির জন্য মানুষের নান্দনিক বিশ্বাসে একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদকে রঁলা আবশ্যক বলে মনে করেন। অর্থাৎ যে তত্ত্ব নীতি ও ধর্মজীবনে প্রযোজ্য, তার প্রয়োগ শিল্পজীবনেও ঘটবে।

মার্ক্সীয় নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে 'ইতিহাসবাদ' কথাটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। কারণ, শিল্পের উৎপত্তি ও ভূমিকা প্রসঙ্গো কার্ল মার্ক্স-এর সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিক বিচারই ইতিহাস আশ্রিত। ইতিহাসের পটভূমিতে তিনি শিল্পের মূল্যায়ন করেছেন। শিল্প হলো মানুষের কর্মকুশলতার সাংস্কৃতিক নিদর্শন। সামাজিক, ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে মানুষ তার অন্তর্গত সত্যকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধির পথে শিল্প হলো একটি পদক্ষেপ। মানুষের নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং তার শিল্প-চেতনার রূপান্তরে শিল্পকলা একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক কৃতি। মার্ক্স মনে করেন, সমাজ শ্রেণির অভ্যন্তরীণ সাধারণ দ্বন্দ্ব ও আনুষঙ্গিক বিবর্তন শিল্পকর্ম ও নান্দনিক ধারণাকে প্রভাবিত করে বলে। তাঁর মতে, মেহনতি মানুষ শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হবে। মার্ক্সবাদীদের নন্দনতাত্ত্বিক

ধারণা শ্রম, কাল (সামাজিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক সময়) এবং কম্যুনিজম-এ তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যে শিল্প মানুষের রুচির নিয়ন্তা যা মানুষের রুচিকে সুরুচির মর্যাদা দেয়, যার মুক্ত আকাশে মানুষের চিত্ত মুক্তি পায় স্বচ্ছন্দ বিচরণে-সেই শিল্পকে মার্ক্স অভিহিত করেন কম্যুনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের বাহন হিসেবে। শিল্প বহন করবে মেহনতী মানুষের পতাকা।

নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাবজেক্টিভিস্ট বলা যায়। তিনি বলেন, "সুন্দরের লীলা আমার জন্য, আমি সেই লীলায় আনন্দিত হই। আমার চেতনায় সুন্দর সত্য ও শাশ্বত। গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে তা গোলাপের নয়, তা আছে মানুষের অনুভূতিতে।" তাঁর মতে, শিল্প হলো প্রকাশ। তবে এ ক্ষেত্রে শিল্পরূপ হলো মুখ্য আর বিষয়বস্তু হলো গৌণ। যদিও উভয়টিই সত্য। তিনি কীটস-এর 'Beauty is truth'কে উদ্ধৃত করে বলেন, শিল্পের সত্য হলো রূপাশ্রয়ী। এ সত্য রূপের ট্রুথ। তিনি আরো বলেন, "Things are distinct not in their essence but in their appearance ; in other words, in their relation to one to whom they appear. This is art, the truth of which is not in substance or logic but in expression." অর্থাৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা ধরা পড়ে শিল্পে প্রতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটাকে প্রকাশ করেন, তা হলো সত্যরূপ। এই রূপের লাবণ্য নির্ভর করে এর প্রকাশের ওপর। এজন্য প্রকাশটাই হলো মূখ্য। শিল্পের রূপ বা প্রকাশকে মুখ্য বললেও রবীন্দ্রনাথ বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করেন নি। শিল্পে মানব- বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ ও সার্থক প্রতিফলন আবশ্যক। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে সমগ্র মানুষ। এই সমগ্র মানবসত্তার প্রতিফলন ঘটে যে শিল্পে, তা-ই সার্থক শিল্প বলে তিনি মনে করেন। মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করাই শিল্পের কাজ। যা কিছু শিল্প-ধারণার মাঝে বিধৃত, তাহলো অনুষঙ্গ মাত্র। এই শিল্প জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিল্প জীবন থেকেই প্রাণরস গ্রহণ করে। ব্যক্তির মানস-জীবন শিল্পে প্রতিভাত হয়। এর পেছনে যা সক্রিয় থাকে, তা হলো বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি ও রুচিবোধ। দেখা যাচ্ছে, তিনি মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেই শিল্পের বিষয়বস্তু গণ্য করেন। আবার অন্যত্র তিনি বলেন, শিল্পলোকে মনুষ্য চরিত্রের সবটাই প্রবেশাধিকার পাবে না। মানুষ যা হতে চায়, যে চারিত্র-উৎকর্ষ মানুষের কাম্য, তা-ই শিল্পে প্রকাশযোগ্য। যে মানুষ স্বভাবধর্মে সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, তাকেই শিল্পে প্রকাশ করতে হবে। এ পর্যায়ে তাঁর বক্তব্য স্ববিরোধী মনে হলেও মূলত তা নয়, বরং তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্তর গুণাবলি ও জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পের শাশ্বত আবেদনকে প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই অনুমিত হয়। অর্থাৎ তিনি মানবিক মহত্তর উৎকর্ষকে শিল্পের পরমার্থিক উদ্দেশ্যরূপেই দেখছেন। এজন্য, পরস্পর বিরোধী ধারণা দুটোর প্রথমটিকে মুখ্য আর দ্বিতীয়টিকে গৌণ বিবেচনা করা তাঁর শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে সংগতিশীল।

রবীন্দ্রনাথের মতে, মহৎ আনন্দই সকল সৃষ্টির লক্ষণ। যে প্রকাশ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ, যা শিল্পের সমার্থক, তা এই আনন্দের ব্যঞ্জনাই বহন করে। এই আনন্দেই বিশ্বজগতের সব গতি, সব স্থিতির নিবৃত্তি। সুতরাং সার্থক শিল্প-প্রচেষ্টা আনন্দেই বিধৃত। এ আনন্দের পথেই শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ঘটে। এ আনন্দ হলো আত্মা ও পরমাত্মার মর্মকোষ। পরমাত্মা হলেন আনন্দ-স্বরূপ। মানবাত্মা শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে পরমাত্মার এ আনন্দ লাভ করে। তাই প্রকাশ ও প্রকাশের আনন্দ সমার্থক। শিল্পীর আনন্দ হলো বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত আনন্দ, যেখানে আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তৃপ্তিসুখের অনুভূতির সঙ্গে এটি সমার্থক নয়। কারণ, শিল্পানন্দ ও পরম আনন্দের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এরা সমার্থক। এক্ষেত্রে রবীন্দ্র-চিন্তায় হেগেলের প্রভাব সুস্পষ্ট কিংবা সাদৃশ্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মতে, শিল্প নিছক অনুভূতি প্রকাশক নয়, শিল্প নয় শুধুমাত্র অপসৃয়মান সাময়িক অনুভূতিকে আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে দেখা। এর সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তি-চরিত্রের নিবিড় যোগসূত্র আছে। আমাদের অনুভূতির বিচিত্রতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে থাকে। শিল্পে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে। সেক্সপিয়রের বিচিত্র সব চরিত্র চিত্রণে সেক্সপিয়রের ব্যক্তিত্ব আপনাকে প্রকাশ করেছে। দান্তের কবিতার সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। শিল্পীর সমগ্র জীবনের ভাষ্যকার হলো তার শিল্প। শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডলে শিল্পরসিককে আকর্ষণ করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একই শিল্পীর হাতে দেবতা ও দানবের চরিত্র সৃষ্টি হয় কীভাবে? রবীন্দ্রনাথ বলেন, শিল্পীমানসের সর্বগ্রাসী সহমর্মিতাবোধ এ অসাধ্য সাধন করে। শিল্পীর সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। এভাবেই তিনি সবার সুখ-দুঃখ

আনন্দ-বেদনা, প্রবৃত্তি- নিবৃত্তি ইত্যাদি অনুভূতির অংশভাগী হন। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের প্রেক্ষিতে এ ভিন্নধর্মী অনুভূতিগুলি মিথ্যে নয়। শিল্পীর বিপরীতধর্মী আবেগ-প্রবণতাও মিথ্যে নয়। শিল্পীর সততাকে তিনি আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেন। পরিশেষে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বে যে দ্ব্যর্থকতা, তা কোনো স্থায়ী বিরোধের পরিণতি পায় না। প্রয়োজনের বেড়াজালে তিনি শিল্প বাঁধতে নিষেধ করেন, আবার শিল্পের অন্তর্গত প্রয়োজনে এক পারমার্থিক উদ্দেশ্যবাদী প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেন। শিল্পকে তিনি মায়া বলেন কিন্তু একেই

আবার আত্মিক শক্তির বিকাশ বা সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ বলেন। শিল্প পরমাত্মার সঙ্গো মানবাত্মার সেতুবন্ধন। জগৎ বা শিল্প তাঁর কাছে মায়া বা মিথ্যে নয়। মূলত শিল্পের দুর্জ্ঞেয় বা অসংজ্ঞেয় স্বভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গো তিনি একে মায়া বলেছেন। শিল্পের প্রকাশধর্মীতার কথা বলে তিনি আমাদের সংবেদনকে শিল্পে প্রতিষ্ঠা দিলেন যা ক্রোচের ধারণার সদৃশ। আবার যা কিছু মহৎ ও শাশ্বত, তাকে শিল্পে প্রাধান্য দেবার কথা বলেন, যা হেগেলের ধারণার সঙ্গো সংগতিপূর্ণ। আর আপাত প্রয়োজনের আড়ালে পরমার্থিক প্রয়োজনের কথা বলে কান্টের সঙ্গো একাত্ম হন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতা স্বরূপত পারমার্থিক।

শিল্পতত্ত্ববিদ কবি সৈয়দ আলী আহসান-এর মতে, শিল্প হচ্ছে মানুষের সুকৃতি এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসাধন, একটি উন্নত এবং তাৎপর্যপূর্ণ কর্মব্যঞ্জনা। সঙ্গো সঙ্গো আবার অবসর বিনোদন ও আনন্দ প্রদানকারী কর্ম। শিল্প মানুষের ব্যক্তিগত আবেগের প্রকাশ, আবার একই সঙ্গো গোষ্ঠীবন্ধ সমাজের উন্নত মানসিকতার প্রতিবিম্ব। শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্যকে বোধের আয়ত্তে আনা। মানুষ তার অনুভূতির দ্বারা সৌন্দর্যকে গ্রহণযোগ্য করে। যুগে যুগে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে শিল্প দৃষ্টিগ্রাহ্যতা থেকে বোধগ্রাহ্যতায় উপনীত হয়েছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিল্পরসিকের চিন্তা, অনুধাবন এবং বিশ্বাস একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সকর্মক হবে, যুক্তি বিষয়কে প্রমাণের আয়ত্তে আনবে এবং একটি বিশ্বাস সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবে। শিল্প হচ্ছে শিল্পীর বিশ্বাস ও বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার। বিশ্বাসের প্রতিফলন ও অনুভূত সত্যের প্রতিবর্ণীকরণ। এটি শুধু বহিরঙ্গাগত আকৃতির প্রতিফলন নয়, অন্তরঙ্গা অভিপ্রায়ের প্রকাশ। আকৃতির অতিরিক্ত সম্ভারটি হলো শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য। তিনি বলেন, শিল্প মানব সংস্কৃতির অভিজ্ঞান। সঙ্গীত, নৃত্য ও কবিতা যেমন মানুষের অভিব্যক্তি ও কুশলতাকে আবিস্কার করে, তেমনি চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য অনুভূতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাকে রূপ দিয়ে থাকে। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাও: আব্দুর রহীম-এর শিল্প-প্রাসঙ্গিক অভিমত এখানে উল্লেখ করছি। তাঁর মতে, ''শিল্পের জন্য শিল্প'' কিংবা ''শিল্প জীবনের জন্য'' সূক্ষ্ম বিচারে এ উভয় আদর্শই অসম্পূর্ণ ও অযথার্থ। কার্যকারণের এ জগতে কোনো জিনিসই নিজের ''কারণ'' হতে পারে না। শিল্পী আমাদের সৌন্দর্যবোধকেই শুধু চরিতার্থ করেন না, আমাদের চিন্তার রুচিশীলতা ও কর্মের প্রেরণাকেও গতিশীল রাখেন। এক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু Freedom means responsibility অর্থাৎ স্বাধীনতা মানে দায়িত্বশীলতা — এ কথাটি স্বীকার করতেই হবে। প্রখ্যাত প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে শিল্পকে ''অনুকৃতির অনুকৃতি'' (copy of copy) আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, শাশ্বত সত্য হলো Idea এবং এ দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে এরই প্রতিভাস (appearance)। শিল্প যেহেতু প্রতিভাসিক জগৎকে অনুকরণ করে, এজন্য তা অনুকৃতির অনুকৃতি। তিনি বলেন, চরমসত্তা শিল্পের নাগালের বাইরে। এজন্য, শিল্প সত্যের প্রকাশ নয়। কিন্তু প্লেটোর এ ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়, কেননা, শিল্প প্রকৃতির অনুসরণ বা অনুকরণ হলেও তা mechanical নয় বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিশীলতা যেখানে জড়ত্বে বাধাপ্রাপ্ত হয়, শিল্প সেখানে জড়াতিক্রান্ত। শিল্প হচ্ছে পরিদৃশ্যমান জগতে আংশিকভাবে ব্যক্ত সত্যের পরিপূর্ণ রূপায়ন-প্রচেষ্টা। Art supplements nature অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করে। প্লেটো পরবর্তী অ্যারিস্টটল এ রকম ধারণার উন্মেষ করেছিলেন। আধুনিক কালে হেগেলের মাধ্যমে যা সংহত রূপ লাভ করে।

মানবজীবনের সঙ্গো সংগীত ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। মানুষের মানসিক বৃত্তি বিকাশে সংগীতের ভূমিকা অপরিসীম। সংগীতানুশীলনকে সার্বজনীন করা গেলে সংগীত সাধনার ভেতর দিয়ে সাংস্কৃতিক ভুবনে উন্নতি সাধিত হতে পারে। সংগীত শিক্ষা, সংস্কৃতির আবশ্যকীয় উপাদান। সংগীত মূলত নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। এ সকল উপাদানে শ্রুতি, সুর, রাগ, গ্রাম, অলংকার, রস, বর্ণ, ভাব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। সংগীতের এ সকল উপাদানের মহিমা ও মাধুর্যকে ইতিহাসের নিরিখে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করার জন্যে সংগীত শিল্পীরা অক্লান্তভাবে ফলিত সংগীতের অনুশীলন করছেন। দৈনন্দিন জীবনে সংগীত বা মিউজিক শব্দটির প্রভাব অত্যধিক বেশি। যে-কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ছন্দময় শব্দগুচ্ছ, যা হৃদয় মাঝে নান্দনিকতা ও অনুভূতির সঞ্চার করে, তাকেই সংগীত বলা যায়। বিগত ৫৫ হাজার বছরের সঙ্গী হিসেবে সংগীত মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে-কোনো শিল্পের মতোই সংগীতের প্রাথমিক কাজ হলো মন-মস্তিস্কে অনুভূতির সঞ্চার করা। সংগীত এমন এক বিষয়বস্তু, যা মস্তিস্কে ডোপামিন ক্ষরণের মাধ্যমে সেই কেন্দ্রকে সক্রিয় করে আনন্দ-অনুভূতির সৃষ্টি করে। ফলে জৈব-রাসায়নিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ইতিবাচক উদ্দীপনার স্বাদ পাওয়া যায়।

সংগীতের প্রধান তিনটি উপাদানের সঙ্গে সকলেই কম বেশি পরিচিত — সুর, তাল এবং লয়। 'লয়' ব্যাপারটিকে উল্লেখ করা হয় একক সময়ে শব্দ বা তালের পরিমাপক হিসেবে, যা প্রতি সেকেন্ড (হার্জ) বা প্রতি মিনিট (বিপিএম) হিসেবে গণনা করা হয়ে থাকে। মজার বিষয় হলো, এই লয়ের পরিমাপের একটি সুস্পষ্ট প্রভাব মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণের মাঝে লক্ষ্য করা যায়। হৃদ্স্পন্দনের গতিবিধির উপরও এর প্রভাব লক্ষণীয়। সাধারণত বিটা তরঙ্গের সংগীত (১৪-৪০ হার্জ) মানব মন-মস্তিষ্ককে দৈনন্দিন কাজের জন্য সর্বোচ্চ সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে, যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক পপ ও রক সংগীত । অপরদিকে আলফা তরঙ্গের সংগীত (৮-১৪ হার্জ) অন্তরে প্রশান্তির অনুভূতি জাগ্রত করে। ব্লুজ, কান্ট্রি ও ফোক সংগীত এই দলভুক্ত। ৪-৮ হার্জভুক্ত থিটা তরঙ্গের সংগীত মস্তিষ্ককে মেডিটেশন, শান্ত ও স্বপ্নময় অনুভূতি প্রদান করে। অন্যদিকে ৪ হার্জের নিচের সীমায় অবস্থান করা ডেল্টা তরঙ্গের সংগীত আমাদের ঘুমের জন্য সহায়ক অনুভূতি যোগায়। ইন্দ্রিয়ের উপর সংগীতের প্রভাব অত্যন্ত ইতিবাচক। যে-কোনো ধরনের সংগীত বা যে কোনো ধরনের গান সরাসরি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে, যা আবেগ ও মৌলিক আচরণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কোনো মানুষ কী ধরনের সংগীত শুনে অভ্যস্ত, তার উপর সংগীতের প্রভাব নির্ভর করে না। সংগীতের প্রভাব নির্ভর করে মূলত মানুষ কীভাবে তার সঙ্গে নিজের আবেগকে সংযুক্ত করতে পারছে, তার উপর। ২০১৬ সালে শ্যাখস ও তাঁর পরিচালিত গবেষকদল একটি গবেষণা করেন যাতে বলা হয় যে, সকল মানুষ কোনো-না-কোনো একটি গানের সঙ্গে নিজের আবেগকে কোনোভাবে সংযুক্ত করতেই পারে। তাতে তাদের মস্তিস্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণ অংশগুলির সঙ্গে অডিটরি কর্টেক্সের মধ্যবর্তী সংযোজক হোয়াইট ম্যাটারের কার্যকারিতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়, যা মস্তিষ্ককে পূর্বের চেয়ে বেশি সচল করে তোলে। US National Library of Medicineএ ২০১৩ সালে প্রকাশিত তথ্যমতে, সংগীত বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিশুদের শ্রবণশক্তি সাধারণ শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। ফলে তাদের দৈনন্দিন মনোযোগ, শ্রবণ বিষয়ক স্মৃতি ও কার্যক্ষমতা অনেক বেশি ভালো ফলাফল প্রদর্শন করে। লিডস্কগের ২০১৬ এর গবেষণা মতে, সঙ্গীত মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সংগীতপ্রেমীরা অনুসরণ বা অনুকরণের বদলে তার প্রিয় শিল্পীদের মতোই নিজেদের অব্যক্ত কথা তুলে ধরতে ও নিজের আলাদা পরিচয় তৈরি করতে বেশি আগ্রহী হয়। ২০১১ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়, যেখানে একদল মানুষকে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়, এবং তারা তাদের কাজ সন্তোষজনকভাবে করতে পারেন নি বলে পরবর্তীতে জানানো হয়। এরপর তাদের দুটি গ্রুপে বিভক্ত করে দুটি আলাদা কক্ষে রাখা হয়। একটি কক্ষ সম্পূর্ণ শান্ত ছিল, আরেকটি কক্ষে মৃদু সংগীত চালু রাখা হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায়, শান্ত কক্ষের চেয়ে সংগীত চালু রাখা কক্ষে থাকা ব্যক্তিগণ পরবর্তীতে এই কাজ আরো ভালোভাবে করার ব্যাপারে বেশি আশাবাদী ও ইতিবাচক ছিলেন।

নাটকের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাহলে সেখানেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপার। মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি শব্দগুলি এসেছে 'মন' শব্দ থেকেই। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রোমান্টিক যুগের কবিগণ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য আলোচনায় মনের বাইরে যেতে পারেন নি, মনস্তত্ত্বকে অস্বীকারও করেন নি। মতভেদ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে, জোর গলায় তাই বলা যায়, সাহিত্যে তথা নাটকে মনস্তত্ত্বের বাইরে কিছু নেই। পরিবেশ-প্রকৃতি ঘিরে সাহিত্যে নির্মিত হয়ে থাকে প্লট, চরিত্র; এই নির্মাণশৈলিতে একাকার হয়ে যায় ভাবাবেগ, চিন্তন কিংবা সৃষ্টিশীলতার অন্তর্লীন শক্তি। কেউ যদি এ নিবন্ধটি পড়ে নতুন ভাবনায় আক্রান্ত হন, যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে উদ্যোগী হন, সেটাও হবে মনঃশক্তির পরিচর্যা, মনঃশক্তির ব্যবহার। সুতরাং প্লেটোর ভাবনা, অ্যারিস্টটলের যুক্তি-চিন্তন-প্রতিভা, কবির কল্পনাশক্তি সবই সাহিত্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত; মনস্তত্ত্বের প্রাণরসায়ন।

শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি একদিকে যেমন ব্যক্তিগত আনন্দের উৎস, অন্যদিকে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ধারক। শিল্পীর সৃজনশীল প্রতিভা এবং রসিকের সংবেদনশীলতার মেলবন্ধনেই শিল্পের সার্থকতা নিহিত। শিল্পের এই বিবর্তনীয় ধারা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি থেকে শুরু হয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত বিস্তৃত যা মানবসভ্যতাকে নিরন্তর সমৃদ্ধ করছে।

তথ্য সূত্র:

১। 'সঙ্গীত-তত্ত্ব', ২য় খণ্ড, দেবব্রত দত্ত, ব্রতী প্রকাশনী, ১৫ বিদ্যাসাগর টাওয়ার, ২ভ ফ্লোর, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৩১৫

 © Santiniketan Sahityapath

২। ওই, পৃ. ২৪০-২৪১
৩। ওই, পৃ. ২৬৫-২৬৬
৪। ওই, পৃ. ২৬২

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দেবব্রত দত্ত , 'সঙ্গীত-তত্ত্ব', দ্বিতীয় খন্ড, ব্রতী প্রকাশনী, ১৫ বিদ্যাসাগর টাওয়ার, ২য় ফ্লোর, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ/ পুনর্মুদ্রণ, ২০১২

২। প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, 'মনোবিদ্যা ও সমাজ দর্শন', ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৫/১এ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলেজ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ/ ষষ্ঠ সংস্করণ/ ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৮৬

৩। Immanuel Kant, 1790 [2000], 'Kritik der Urteilskraft', Berlin/Libau: Lagarde und Friedrich;translated as 'Critique of the Power of Judgment', Paul Guyer (trans./ed.), Eric Matthews (trans.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

বৈদ্যুতিন সূত্রাবলি:

• https://www.newsg24.com/culture-news/105/
•https://m.facebook.com/nt/screen/?params=%7B%22note_id%22%3A343473756983842%7D&path=%2Fnotes%2Fnote%2F&_rdr

—

Prantik Gabeshana Patrika



© Santiniketan Sahityapath